পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বন্দি

বিশ্বজিৎ রায়

কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য রাজ্য-সরকারগুলির মতোই পশ্চিমবঙ্গের শাসকরাও রাজনৈতিক বন্দির তালিকা প্রকাশ্যে হাজির করেন না। তবে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট আমলে জেল আইন সংশোধন করে রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং স্বীকৃতির ব্যবস্থা হয়। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের চাপে এবং বাম রাজনীতির অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুরনো জেল আইন বদলে ১৯৯২ সালে প্রণীত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট'-এ রাজবন্দির আইনে বন্দির আবেদনের ভিত্তিতে রাজবন্দি বা 'ডিভিশন ওয়ান' বন্দির স্বীকৃতিদানের ক্ষমতা আদালতের হাতে ন্যস্ত হলেও আইনি মাপকাঠির ভিত্তিতে কারাবিভাগের আইজি-কেও প্রাথমিকভাবে বন্দিকে এই মান্যতাদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। বকলমে ওটা সরকারি স্বীকৃতির ব্যবস্থা। কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন তথা গণসংগ্রামের শেকড়ে ফেরার তাড়না হারিয়ে ক্ষমতাই নয়নের মণি হয়ে ওঠার পর শাসক ধর্মে থিতু সিপিএম রাজনৈতিক বন্দির অস্তিত্ব স্বীকার করত না। দুই-একজন নেতা বাদ দিলে মধুলোভী শরিক দলগুলিও রাজনৈতিক প্রতিহিংসাজাত ধরপাকড়ে বন্দিদের নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলনের পর্বে জেলে জেলে বাম সরকার বিরোধী বন্দির সংখ্যা বাড়লে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দিমুক্তির দাবিতে গলা মেলান। এই বন্দিদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের পৃথক কামতাপুর এবং গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা ছাড়াও গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কয়েকজন নেতা-কর্মীও ছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু এসইউসিআই নেতা-কর্মী, যাদের অনেকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী কৃষক প্রতিরোধে যুক্ত ধৃত তৃণমূল সমর্থকদের সঙ্গে ছিলেন এসইউসিআই এবং বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠী সহ অপরাপর বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীরা। তবে রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ে লালগড় তথা জঙ্গলমহল আন্দোলন পর্বে। পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বে সরকার ও শাসক দলের নিপীড়ন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতিরোধে এই গণবিস্ফোরণ হলেও একটা পর্বের পর তা মার্কসবাদী-মাওবাদী খুনোখুনিতে পর্যবসিত হয়। পুলিশের চর হিসেবে সন্দেহভাজন অথবা সিপিএম ও কমিটি সমর্থক হওয়ার অপরাধে বহু সাধারণ মানুষের প্রাণ যায়। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ আধা-সামরিক বাহিনী ও শাসকদলীয় 'হার্মাদ' বাহিনী বনাম মাওবাদী এবং তৃণমূল সহ অন্যান্য সরকার-বিরোধীদের রক্তাক্ত যুদ্ধে লাশের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে জেলবন্দির তালিকা। এদের একটি বড় অংশ সাধারণ আদিবাসী-মূলবাসী যুবক। মাওবাদী সন্দেহে ধৃতদের মধ্যে অন্তত শ'খানেকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহে উস্কানি, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইত্যাদি ফৌজদারি দণ্ডবিধিভুক্ত ধারা এবং অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক আইন ছাড়াও ইউএপিএ আইন লাগু হয়। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস ভয়াবহ নাশকতায় লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে দেড়শোরও বেশি যাত্রী প্রাণ হারানোর পর নির্বিচার ধরপাকড়, ভুয়ো সংঘর্ষ খুন, হাজতে অত্যাচার এবং নিবর্তনমূলক আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার বেড়ে যায়। জঙ্গলমহল আন্দোলনের দিনগুলোয় উচ্চকিত রাজনৈতিক চাপান-উতোর চলে। সিপিএম নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে মমতা-মাওবাদী আঁতাতের অভিযোগ তুলে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথবাহিনীর 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযানের ন্যায্যতা প্রমাণে মুখর হয় এবং 'হার্মাদ'দের সহযোগে অত্যাচার, ধরপাকড় তথা পুলিশ-রাজ কায়েমের অভিযোগ উড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মমতা জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, 'হার্মাদ'দের গ্রেফতারি এবং শাসকীয় প্রতিহিংসায় ধৃত বন্দিদের মুক্তির দাবিতে সরব হন। মাওবাদীদের সঙ্গে তাঁর মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের বন্ধু, ভ্রাতৃ-সম্বোধনে প্রীতি জানিয়ে বিদ্রোহীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রীয় নেতা আজাদের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের দাবিও জানান তিনি। 'সামাজিক ফ্যাসিবাদী' সিপিএম ও যৌথবাহিনী-হার্মাদদের বিরুদ্ধে কিষেণজীর নেতৃত্বে মাওবাদীরাও মমতা ও তাঁর দলকে মিত্রজ্ঞানে সাহায্য করেছেন। সে সময়ের জঙ্গলমহলে সাংগঠনিক প্রতিপত্তিহীন মমতা ও তাঁর সহযোগীদের সভায় জনসমাগমের উদ্যোগ নেয় মাওবাদী প্রভাবিত জনসাধারণের কমিটি ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে। কমিটির জেলবন্দি নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে মমতা-দূতেদের আলোচনা ভেস্তে গেলে ছত্রধর নির্দল প্রার্থী হিসাবে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু বাম-বিরোধী ভোট ভাগের আশঙ্কায় মাওবাদী নেতৃত্ব ছত্রধরের পাশে দাঁড়াননি। বস্তুত জঙ্গলমহলে তৃণমূল এই নির্বাচনী পর্বে তাঁদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনই পেয়েছে। জনসাধারণের কমিটির জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে কমিটির সঙ্গে যুক্ত নকশালপন্থী ঘরানার তিনজনকে প্রার্থীও করেন মমতা।

বন্ধু যখন শত্রু

কিন্তু মমতা ক্ষমতায় আসার পর সমীকরণ দ্রুত বদলাতে থাকে। যে কথা মমতা ও মাওবাদী নেতৃত্ব আজ আর স্বীকার করবেন না এবং দুই শিবিরের ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরাও চুপ করে থাকবেন তা হল, পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস সত্ত্বেও নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক বোঝাপড়ার তাগিদ দু-তরফেই ছিল। রাজনৈতিক

বন্দিমুক্তি প্রশ্নে মমতার অবস্থান এবং মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনায় তাঁর উদ্যোগ দ্বিমুখী রাজনৈতিক কৌশলের অঙ্গ। সরকার-ঘনিষ্ঠ এবং বিরোধী মানবাধিকার কর্মীদের দাবিমতো নির্বাচনী ইস্তেহারে রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তির প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি। বদলে বন্দিরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার না প্রকৃতই শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী তা খতিয়ে দেখতে 'কেস টু কেস' পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শর্তসাপেক্ষ মুক্তির কথা বলেন। এভাবেই রাজনৈতিক অঙ্কের ভিত্তিতে বন্দিমুক্তির খুড়োর কলটি ঝুলিয়ে দেন। ক্ষমতায় এসে রিভিউ কমিটি গঠনের সময় আরও সাঙ্ঘাতিক শর্ত জুড়ে দেন। মুক্তির যোগ্যতা বিচারের সময় জেলে থাকাকালীন বন্দীর আচরণ তো বটেই, মুক্তির পর তাঁর আচার-আচরণের সম্ভাব্য গতি-প্রকৃতিও বিবেচ্য থাকবে। কমিটির মাথায় একজন প্রাক্তন বিচারপতি এবং সদস্য হিসাবে দুই নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার কর্মীকে নিলেও মানবাধিকার সংগঠনগুলি বা পরিবর্তনপন্থী বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সঙ্গে কোনও আলোচনা নতুন সরকার করেনি। বরং কমিটিতে সমসংখ্যক সরকারি আমলা ও পুলিশের কর্তাদের নিয়ে এসে এর কার্যকলাপের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে সরকারি উদ্যোগে মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি-আলোচনার জন্য প্রস্তুতি কমিটিতে তিনজন মানবাধিকার কর্মী এবং অপরাপর সরকার-ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা ঠাঁই পেলেও অন্ধ্রের 'কমিটি অফ কনসার্নড সিটিজেনস'-এর শান্তি উদ্যোগের মতো বৃহত্তর নাগরিক সমাজের স্বাধীন এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রস্তুতিপর্ব এক্ষেত্রে ছিল না।

বন্দিমুক্তি ও শান্তি-উদ্যোগের রাজনীতি

সরকার-ঘনিষ্ঠ মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ ও তাঁদের বিরোধীদের বিতর্কে বন্দিমুক্তি এবং শান্তি-আলোচনার ওতপ্রোত সম্পর্ক তথা মমতার দরকষাকষির দ্বিমুখী কৌশল নিয়ে কোনও আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। বিধানসভা ভোটের পর জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রশ্নে নয়া শাসকদল, তার 'ভৈরববাহিনী', বনাম মাওবাদীদের বিরোধ খুনোখুনিতে গড়ায়। জনসাধারণের কমিটির মূল দাবিসমূহ, অর্থাৎ বাম-শাসনপর্বে পুলিশি অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের শাস্তি, সমস্ত বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার এবং স্থানীয় উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ইস্যুগুলিতে সরকারি টালবাহানা ছিল ওই দ্বিমুখী দরকষাকষির কৌশলেরই অঙ্গ। শান্তি-উদ্যোগের পাশাপাশি জঙ্গলমহলে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর লাগাতার হুমকি, যৌথবাহিনী ও 'ভৈরব'দের তৎপরতা বৃদ্ধি, স্থানীয় যুবকদের স্পেশাল পুলিশকর্মী নিয়োগের ঘোষণা এবং নতুন করে জনসাধারণের কমিটির নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় পরিস্থিতি বিষিয়ে তোলে। ভৈরববাহিনীর সংগঠক এই অভিযোগে তৃণমূল নেতা-কর্মী এবং কমিটি-ত্যাগীদের হত্যা করে মাওবাদীরাও কর্তৃত্ব ধরে রাখার চেষ্টা চালান। শেষপর্যন্ত তারা একমাসের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেও তাতে কোনও লাভ হয়নি।

মাওবাদী নেতৃত্ব সম্ভবত চেয়েছিলেন জঙ্গলমহলে তাদের আধিপত্য মমতা মেনে নেন। যাতে ছত্তিশগড়-ঝাড়খণ্ড-ওড়িশার আদিবাসী-প্রধান দুর্গম অঞ্চলে তাদের অভীষ্ট ঘাঁটি এলাকাগুলির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকে। বিনিময়ে তাঁরা মমতার এলাকায় সাংগঠনিক ও সামরিক তৎপরতা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু সিপিএমের মতোই সরকার ও শাসকদলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর মমতা। তিনি বুঝে যান, মাওবাদীরা তার সহযোগী শক্তি হিসাবে জঙ্গলমহলের প্রান্তিক অঞ্চলে ছোটখাটো ক্ষমতার মধু পেয়ে সন্তুষ্ট হবে না। ফলে পুলিশ-শাসকদল যৌথ সশস্ত্র অভিযান বাড়ে। মাওবাদী-নেতৃত্ব

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা অন্য রাজ্যের জেলে বন্দি

১. লক্ষ্ণৌ জেল	:	৪ জন ('হুজি' সমর্থক সন্দেহে ধৃত। উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ, রাজমিস্ত্রি, জোগানদারের কাজে উত্তরপ্রদেশ যান)
২. ঘাটশিলা জেল	:	২৫ জন (বেশ কয়েকজন মহিলাসহ মাওবাদী সন্দেহে ধৃত। জঙ্গলমহলের বাসিন্দা)
৩. সরাইকেলা জেল	:	চারজনের বেশি (মাওবাদী সন্দেহে ধৃত)

তথ্যসূত্র : *বন্দীমুক্তি কমিটির সংবাদ বুলেটিন*, জানুয়ারি ২০১৩।

রাজ্যের জেলগুলিতে রাজনৈতিক বন্দিদের অসম্পূর্ণ তালিকা

মাওবাদী, পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি, আদিবাসী-মূলবাসী জনগণের কমিটির সদস্য-সমর্থক

১. মেদিনীপুর জেল	:	৬৫
২. প্রেসিডেন্সি জেল	:	২০ (১ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত)
২. দমদম জেল	:	৮ (২১ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত)*
৪. কৃষ্ণনগর জেল	:	১১ (২১ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত)
৫. বহরমপুর জেল	:	৮ (৪ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত)
৬. অন্যান্য জেল	:	৪
৭. মল্লিলা জেল	:	২

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম জেলের হিসেব পাওয়া যায়নি।

এস ইউ সি আই দলের সদস্য-সমর্থক

১. আলিপুর জেল	:	২৬ জন (যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত)
২. দমদম জেল	:	২০ জন

লস্কর-ই-তৈবা বা অন্যান্য জিহাদি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ধৃত

বহরমপুর জেল	:	২

*এপিডিআর প্রকাশিত 'বন্দীকথা' শীর্ষক পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট তালিকা অনুযায়ী ৭ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দমদম জেলে রাজবন্দির সংখ্যা ১৯।

বুঝতে পারেননি অথবা বুঝতে চাননি যে সিপিএম-বিরোধিতার সূত্রে অর্জিত ঐক্যের জনভিত্তি ধ্বসে গেছে। যুদ্ধক্লান্ত আমজনতা নতুন সরকারকে সময় দিতে চায়। সরকারি বাহিনীর হাতে কিষেণজীর হত্যায় শান্তি-উদ্যোগের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

জঙ্গলমহলে একচ্ছত্র ক্ষমতা কায়েমের পথে কাঁটা একদা-বন্ধুদের নির্মম উচ্ছেদ এবং দীর্ঘতর কারাবাস সুনিশ্চিত করাই ছিল মমতার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নাইডু, ওয়াই এস আর রেড্ডি বা ওড়িশার নবীন পট্টনায়কের পথেই হেঁটেছেন তিনি।

রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির প্রশ্নে শান্তি-উদ্যোগ এবং পরবর্তী সময়ে মমতা সরকারের সমস্ত পদক্ষেপের প্রেক্ষাপট এটাই। যাঁরা এ নিয়ে ঝেড়ে কাশছেন না, তাঁরা ভাবের ঘরে চুরি করছেন মাত্র। মানবাধিকারের রাজনীতি এবং রাজনীতি-বিযুক্ত মানবাধিকারের প্রবক্তারা সকলেই আড়ালে বন্দিমুক্তি ও শান্তি-উদ্যোগের আন্তঃসম্পর্ক স্বীকার করলেও প্রকাশ্যে এই 'রিয়েল-পলিটিক'টির অস্তিত্ব এড়িয়ে যান। কিন্তু আমরা এই আন্তঃসম্পর্কটির উপর জোর দিচ্ছি। এর মানে এটা নয় যে সরকারের সঙ্গে আপসে না গেলে সমালোচক-বিরোধীদের রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না বা তাঁদের জেলে পচিয়ে মারা ন্যায্য। বরং শাসকীয় রাজনীতির ভণ্ডামি, সরকার-মুখাপেক্ষী নাগরিক সক্রিয়তার সুবিধাবাদ, পাশাপাশি বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে সংসদীয় বিরোধী দলগুলির সমঝোতার ফাঁদ ও মতাদর্শগত অন্ধতা কীভাবে মানবাধিকার ইস্যুগুলিকে আবিল করে তোলে, অনতি-অতীতের ইতিহাস তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

রিভিউ কমিটি

নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের আগেই তদানীন্তন মুখ্যসচিব সমর ঘোষের কাছে এক চিঠিতে এপিডিআর ৪৮৩ জন রাজনৈতিক বন্দির তালিকা দিয়ে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানায়। চিঠিতে এটাও বলা হয়, তালিকাটি অসম্পূর্ণ এবং রাজ্য কারা দফতরের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা। পূর্বতন সরকারের আমলে আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাজবন্দির সংখ্যা অপ্রতুল, এ কথা উল্লেখ করে নতুন সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের আশা জানিয়ে রাজ্যে শান্তি ও সুবিচারের স্বার্থে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইস্যুগুলিতে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠকের জন্য 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট'ও চায় স্বাধীনতোত্তর ভারতে এ রাজ্যের তথা দেশের সবচেয়ে পুরনো মানবাধিকার সংগঠনটি। অপর প্রধান মঞ্চ বন্দিমুক্তি কমিটি কোনোও তালিকা না পেশ করলেও তার সম্পাদকের হিসেব মতো রাজবন্দির তৎকালীন সংখ্যা ছিল ছশোর কাছাকাছি। কিন্তু নতুন সরকার এপিডিআর ও বন্দীমুক্তি কমিটি সহ অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলিকে কোনও বৈঠকে ডাকেনি। তবে মমতা-ঘনিষ্ঠতার সুবাদে এপিডিআর-এর দুই প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং বন্দীমুক্তি কমিটির সম্পাদক সহ কয়েকজন সক্রিয় পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবী রিভিউ কমিটি ও শান্তি-উদ্যোগে যুক্ত হন ব্যক্তিগতভাবে। এরা আবার সকলেই 'ফ্রেণ্ডস অব ডেমোক্র্যাসি' নামে সংগঠনের সদস্য, যারা নির্বাচনে 'নো টু সিপিএম' ডাক দিয়ে তৃণমূলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নামেন। নিঃশর্ত মুক্তির দাবি মমতার ইস্তাহারে আমল না পাওয়ার জেরে মমতা-ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর সঙ্গে দূরত্ব রাখায় পক্ষপাতী মানবাধিকার কর্মীদের মতাবিরোধ বাড়ছিল। রাজনৈতিক ধারার বিচারে দুপক্ষেই অনেকে নকশালবাড়ীর ধারার অনুগামী। বামফ্রন্ট ভুক্ত দলগুলি তথা সাধারণভাবে বামপন্থী মতাদর্শ-রাজনীতির আবহে বেড়ে ওঠা শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলের মতোই মানবাধিকারে আন্দোলনেও ফাটল ধরে মমতা ও তাঁর দল এবং নতুন সরকারের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে। রিভিউ কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স বা বন্দিমুক্তির শর্তাদি এবং কমিটি গঠন নিয়ে বিতণ্ডা এই ফাটলকে গভীর করে তোলে।

'ফ্রেণ্ডস অব ডেমোক্র্যাসি' ও তার সহগামীরা নিরঙ্কুশ জনাদেশে অভিষিক্ত নতুন সরকারকে সময় দেওয়ার পক্ষে এবং শর্ত-কণ্টকিত রিভিউ কমিটির মাধ্যমেই রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি ত্বরান্বিত করায় আস্থা রাখেন। তাঁদের বিরোধীরা প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের রাজবন্দীদের নিঃশর্তে মুক্তির সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি চাইলে গণতন্ত্রের বন্ধুরা পাল্টা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ভিন্ন ছিল এবং ঐ পর্বেও সব বন্দি ছাড়া পেতে দেড়-দুবছর লেগে গিয়েছিল। এ দফায় মুক্তির যোগ্যতা বিচারে বন্দির ভবিষ্যত রাজনৈতিক আচার-আচরণের নিক্তি ওজন অপমানজনক এবং মুচলেকা-মুক্তির সামিল, পাকেপ্রকারে তা স্বীকার করেও মমতা-ঘনিষ্ঠরা এর দায় চাপান আমলা-পুলিশকর্তাদের ঘাড়ে। পরবর্তী মাসগুলিতে রিভিউ কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দিদের স্বীকৃতির প্রশ্নে বিলম্ব, এমনকি সরকারপক্ষীয় উকিলদের বিরোধিতার নেপথ্যে বাম-আমলের আইনে আদালতে ন্যস্ত ক্ষমতা ও সিপিএম শিবির-ভুক্ত পাবলিক প্রসিকিউটরদের অন্তর্ঘাত এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতাকেই তাঁরা দায়ী করেছেন। শান্তি-উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়দায়িত্বের প্রশ্নেও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকাকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

সরকারি সূত্র মোতাবেক, কারা দফতর রিভিউ কমিটির কাছে ২০১১ সালের মাঝামাঝি ৭৯ জন বিচারাধীন রাজবন্দির তালিকা হাজির করে যারা আদালতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এদের সংখ্যাগুরুই উত্তরবঙ্গের। ৪৪ জন কোচবিহারে এবং ১৭ জন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলে। সকলেই গ্রেটার ও কামতাপুরী আন্দোলনের কর্মী। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের কৃষ্ণনগর জেলে বন্দী ১২জন এবং প্রেসিডেন্সি, দমদম ও মেদিনীপুর

জেলে বন্দি ৬ জন মূলত সন্দেহভাজন মাওবাদী হিসেবে অভিযুক্ত। রিভিউ কমিটি প্রথম দফায় ৭৮ জন বন্দির মুক্তির সুপারিশ জানালেও সরকারিভাবে তা কাটছাঁট করে ৫২ জনের তালিকা তৈরি হয়। ২০১১ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এদের জামিনে মুক্তিদানের কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘোষণা করলেও তালিকাভুক্ত ২ জন মাওবাদী নেতা-কর্মী, চণ্ডী সরকার ও প্রদীপ চ্যাটার্জীকে ছাড়া হয়নি। বয়োবৃদ্ধ চণ্ডীবাবু অনেক পরে আদালত থেকে ছাড়া পান। প্রদীপ এখনও জেলে। বাকি ৫০ জন উত্তরবঙ্গের দুই আন্দোলনের কর্মী এবং মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। বাম-আমলে রাজবংশীদের এথ্‌নিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বশাসনের আন্দোলন সরকারি প্রতিকূলতার মুখে পড়ে। কেএলও সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে সিপিএম নেতা-কর্মীদের খুনও করে। কিন্তু পরিবর্তিত পটভূমিতে দার্জিলিং-এ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মতোই উত্তরবঙ্গের সমতলে আত্মপরিচিতির আন্দোলন-সংগঠনগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে মমতা এদের মুক্তি দেন। তবে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে গেলে বা এথ্‌নিক আন্দোলন বঙ্গ ভঙ্গের দাবিতে সোচ্চার হলে তিনিও যে সিপিএমের পথে হেঁটে পুলিশি দমন-পীড়নের অস্ত্র প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত তা পাহাড়ের সাম্প্রতিক গোর্খা জন মুক্তি মোর্চার নেতা-কর্মীদের পুরনো মামলায় গ্রেফতারিতে স্পষ্ট।

কিন্তু মাওবাদী এবং তাঁদের সহযোগী জনসাধারণের কমিটির নেতাদের সঙ্গে মমতার কোনও রাজনৈতিক সমঝোতা না হওয়ায় শান্তি-উদ্যোগের মধ্যপথে মুক্তির তালিকাভুক্ত দুই মাওবাদী বন্দিকে তিনি ছাঁটাই করে দেন কেন্দ্রীয় সরকারের দোহাই দিয়ে। রিভিউ কমিটি দুদফায় সমস্ত বিচারাধীন ও দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির সুপারিশ করলেও তিনি মাওবাদী সন্দেহে বন্দিদের ক্ষেত্রে কমিটির মতামতে আজ পর্যন্ত কোনওরকম আমল দেননি। তাঁর নিজের রাজনৈতিক অঙ্ক মেনে তিনি সেটুকু সুপারিশই মেনেছেন যা তাঁর দল ও সরকারের আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ এবং জনভিত্তিকে সংহত করবে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে মমতার সঙ্গী এবং পরবর্তীকালে লোকসভা নির্বাচনে জোট-শরিক এসইউসিআই সিপিএম জমানায় পুলিশি দমনপীড়নের নিত্য শিকার ছিল। এই দলের ৫৪ জন নেতা-কর্মী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইউপিএ সরকারে যোগদান ও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে এসইউসিআই জোট থেকে সরে এলেও মমতা-জমানায় সুন্দর চ্যাটার্জী সহ দলের কয়েকজন নেতা-কর্মী মুক্তি পেয়েছেন। এছাড়া সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে 'ম্যাজিস্ট্রেট ট্রায়াল' এবং 'সেসন্‌স ট্রায়াল' তথা সাধারণ হাঙ্গামা, অবৈধ জমায়েত ইত্যাদির মামলায় অভিযুক্তদের সঙ্গে খুন-জখম ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগে বন্দিদের জামিনে মুক্তি এবং কেস প্রত্যাহারেও সরকারি তৎপরতা দেখা গিয়েছে। কারণ যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে সামনে রেখে মমতার ক্ষমতাপ্রাপ্তি, সেখানকার আন্দোলনকারীরা জেলে থাকলে সরকারের রাজনৈতিক বিড়ম্বনা। দ্বিতীয়ত, এই দুই জায়গাতেই তৃণমূলের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ এখনও অটুট। রিভিউ কমিটির সুপারিশ মেনে সরকার বৃদ্ধ, অশক্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের অনেককে মুক্তি দিয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হিসেবে এই মুক্ত অরাজনৈতিক বন্দিদের সংখ্যা ১৮০।

দুয়োরাণীর ছেলেমেয়েরা

পক্ষান্তরে লালগড় তথা জঙ্গলমহলে মাওবাদী এবং একদা ছত্রধর মাহাতোর নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের কমিটির বন্দি নেতা-কর্মীরা দুয়োরাণীর সন্তান। কমিটির সঙ্গে তৃণমূলের আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্বে রিভিউ কমিটির সামনে জঙ্গলমহলের বন্দিদের মামলাগুলি বিবেচনার জন্য হাজিরই করেনি সরকারপক্ষ। ২০১১-এর ডিসেম্বরে কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টের আগে সরকারি নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে, কমিটি ৭৮ জন স্বীকৃত রাজবন্দির মুক্তিসহ মোট ৬৬৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে। এতে সিঙ্গুরের ১০৮টি, নন্দীগ্রামের ৪৭৬টি এবং আলিপুর সেসন্‌স কোর্টের তিনটি বিচারাধীন মামলার উল্লেখ থাকলেও লালগড় বা জঙ্গলমহল মামলাগুলির কোনও উল্লেখ নেই। ওয়াকিবহাল সূত্রের হিসেবে জনসাধারণের কমিটির প্রায় ২০০০ সমর্থক বিভিন্ন মামলায় বন্দি বা জামিনপ্রাপ্তির পর কেস কানেকশনে অন্য মামলায় হাজতে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মুক্তির প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়নি রাজনৈতিক কারণেই। মাওবাদীদের সঙ্গে সরকারের শান্তি-উদ্যোগ শুরু থেকেই টলমল পায়ে হাঁটছিল। ২৪ নভেম্বর কিষেণজির হত্যায় তা মুখ থুবড়ে পড়ে। রিভিউ কমিটির ডিসেম্বরের অন্তর্বর্তী রিপোর্টে তাই সন্দেহভাজন মাওবাদী এবং জনসাধারণের কমিটির সাধারণ সমর্থকদের মুক্তির প্রসঙ্গ অনুপস্থিত, কমিটি সদস্য সরকারপক্ষীয় এক আমলার ব্যাখ্যা এমনটাই। কমিটির অন্তর্বর্তী এবং ২০১২-র আগস্টের চূড়ান্ত রিপোর্ট, কোনটাই আজও জনসমক্ষে না আসায় ছত্রধর মাহাতোসহ জঙ্গলমহলের বন্দিদের মুক্তি এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের প্রশ্নে কমিটির সুপারিশ ও সরকারি সিদ্ধান্ত আমরা জানতে পাইনি। ইতিমধ্যে ছত্রধর আদালতে রাজবন্দির মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে রুজু ৩২টি মামলায় জামিন এবং একটিতে খালাসপ্রাপ্ত ছত্রধরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহে উস্কানির অভিযোগ ঝাড়গ্রামের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে ধৃত ছত্রধর ও তাঁর সঙ্গী সুখশান্তি বাস্কে প্রমুখ আজও বন্দি। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে ছত্রধরের সঙ্গে লালগড়ে এক জমায়েতে হাজির সেদিনের

বিরোধী নেত্রী তথা আজকের মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ-প্রশাসন ছত্রধরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের চার্জ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় এবং রাজবন্দির মর্যাদা চেয়ে আদালতে তাঁর আবেদনের বিরোধিতা করেন।

রিভিউ কমিটি তিহার জেলে বন্দি মাওবাদী দলের পলিটব্যুরো সদস্য কোবাদ গান্ধীর এক চিঠির ভিত্তিতে পশ্চিমবাংলায় একটি মামলায় এফআইআর-এ অভিযুক্তের তালিকা (শালবনি থানা, কেস নম্বর ৮১/২০০৮, আইপিসি ধারা ১২১/১২১এ/১২৩) থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ জানায়। একদা আজাদ হত্যার তদন্তের দাবিতে গলা-মেলানো বিরোধী নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী গান্ধীর ক্ষেত্রে কমিটির-সুপারিশ কার্যকর করেছেন, এমনটা জানা নেই। যদিও কোবাদের চিঠিকেই সরকারি রিভিউ কমিটির প্রতি মাওবাদী নেতৃত্বের আস্থার বিজ্ঞাপন হিসাবে তুলে ধরতেন কমিটির বেসরকারি সদস্যরা।

শুধুমাত্র আইনি প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে সরকার হাত গুটিয়ে রাখলে মমতার বন্দিমুক্তির রাজনীতির ছকটা তত স্পষ্ট হত না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কয়েকমাস আগে জঙ্গলমহলে তৃণমূলের উদ্যোগে একটি মুচলেকা-পত্রের 'প্রোফর্মা' বিলি হয়। তাতে বাম-জমানায় বন্দি জামিন পেলেও মামলায় জেরবার অভিযুক্তদের অব্যাহতির আবেদনে লিখতে হয়েছে যে তাঁরা 'গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন'। রাজ্যজুড়ে বিপুল জনাদেশে জয়ী হওয়ার পরও জঙ্গলমহলে রাজনৈতিক আনুগত্য আদায়ের এই নির্লজ্জ প্রয়াসে স্পষ্ট, জয় করেও ভয় যায়নি মমতার। এই মুচলেকা-পত্রের ভিত্তিতে এবং অন্যবিধ উপায়ে চাপের কাছে নতি-স্বীকার করে জনসাধারণের কমিটির বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী জামিন পেয়েছেন। প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা অনেকেই আজ জঙ্গলমহলে তৃণমূলের নেতা। একসময়ে সাড়া-জাগানো মাওবাদী স্কোয়াড নেত্রী সদস্যসহ বেশ কয়েকজন আত্মসমর্পণ করে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যর্থনাও পেয়েছেন। অর্থাৎ শাসক-শিবিরে যোগ দিলে মুক্তি পাবে, নতুবা জেলে পচে মরবে।

প্রশ্ন করলেই মাওবাদী

অন্যদিকে মাওবাদী অভিযোগে ধরপাকড় চলছে। নতুন করে ইউএপিএ আইন প্রয়োগ হচ্ছে এবং তা শুধু শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা বলে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কলকাতার নোনাডাঙ্গায় ঝুপড়িবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে মিছিল-ধরনা পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করেই থেমে থাকেনি মা-মাটি-মানুষের সরকার। 'অস্ত্র-বোমা জড়ো করে সরকার বিরোধী নাশকতা'র চক্রান্তের অভিযোগে পুলিশি হাজত ও কারাবাস করতে হয়েছে সিঙ্গুর আন্দোলন পর্বে মমতার সহযোগী নকশালপন্থী কর্মীদেরও। নন্দীগ্রামে তৃণমূল-মাওবাদী ষড়যন্ত্রের নায়িকারূপে সিপিএমের প্রচারে বারংবার উল্লিখিত মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির নেত্রী দেবলীনা চক্রবর্তী গ্রেফতার হন নোনাডাঙ্গা-বিক্ষোভ পর্বে। রাজদ্রোহে ও রাষ্ট্রবিরোধী যুদ্ধের দায়ে অভিযুক্ত দেবলীনা দীর্ঘ কয়েকমাস পর জামিনে ছাড়া পেলেও পরে ধৃত তার সহযোগী জয়িতা দাস আজও বন্দি— মাওবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগেই। বস্তুত, নোনাডাঙ্গা থেকে বেলপাহাড়ি, নতুন শাসককে প্রশ্ন করার স্পর্ধা দেখালেই মাওবাদী হিসেবে হাজত ও কারাবাস নিশ্চিত। কামদুনিতে ধর্ষণবিরোধী স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভের নেপথ্যেও মাওবাদী প্ররোচনার ভূত দেখতে পেয়েছেন একদা বিরোধী নেত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। সরকার পরিবর্তনের দু'বছরের মধ্যেই মাওবাদী-সিপিএম আঁতাতের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। যা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে সিপিএম-এর প্রচারের বর্শামুখ, তাই তিনি ঘুরিয়ে দিচ্ছেন আজকের বিরোধী পক্ষের দিকে।

গত দুবছরে সরকারি বিরোধিতা সত্ত্বেও জনা কুড়ি মাওবাদী অভিযুক্ত আদালত থেকে রাজনৈতিক বন্দির স্বীকৃতি পেয়েছেন। এর মধ্যে মাওবাদী মুখপাত্র বলে পরিচিত গৌর চক্রবর্তী, ছত্রধর মাহাতো, সুখশান্তি বাস্কে, প্রসূন চ্যাটার্জি, সগন মুর্মু, শম্ভু সোরেন ও ভেঙ্কটেশ্বর রেড্ডি স্বীকৃতি পান কলকাতা হাইকোর্টের ২০১২-র ৮ আগস্টের রায়ে। ২১ সেপ্টেম্বরে 'সেশন্‌স কোর্টে' এই স্বীকৃতি পান আরও নয়জন। এর মধ্যে রয়েছেন মাওবাদীদের সামরিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত কমিটির প্রধান বলে অভিযুক্ত সাদানালা রামকৃষ্ণ। হাইকোর্ট রাজবন্দি ও সাধারণ বন্দিদের মধ্যে পার্থক্য এবং তদনুযায়ী সুযোগসুবিধা বরাদ্দের ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক বললেও বিদ্যমান আইনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৃত অপরাধে অভিযুক্ত হিসাবে ঐ বন্দিদের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেন। শুধু তাই নয়, বেআইনি রাজনৈতিক কার্যকলাপে অভিযুক্তকেও ওই রাজবন্দির মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এপিডিআর, পিইউডিআর সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এই রায়কে মোটের উপর স্বাগত জানায় এবং রাজ্য আইনে বর্ণিত রাজবন্দির সংজ্ঞা মেনে সরকারকে অপরাপর সমগোত্রীয় বন্দিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্বীকৃতিদানে উদ্যোগী হওয়ার দাবি করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'রাজনীতি'র সীমা ও সংজ্ঞাকে বাড়িয়ে রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিবাদ-প্রতিরোধকেও ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য রাজনীতি রূপে স্বীকৃতির দাবি এই রায়ে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হলো বলে মনে করছেন তাঁরা। অন্যদিকে জেলে বন্দিদের সুযোগ-সুবিধায় সমানাধিকার দানে আদালতের নির্দেশে সমর্থন জানালেও 'রাজনৈতিক' ও 'রুটিন' অপরাধের সীমা ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাবে তারা একমত হননি।

প্রতিপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার আদালতের সিদ্ধান্তে প্রমাদ গণে। কেন্দ্র-রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তথা 'মাওবাদী

এবং জিহাদি সন্ত্রাস দমনে' ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা-পুলিশ কর্তারা রায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁদের আশঙ্কা, এর ফলে দুই গোত্রের সন্ত্রাসবাদীরাই আইনি মান্যতা পাবে এবং এদের মুক্তির পথ সহজ হয়ে উঠবে। টাডা-পোটা, স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট, আমর্ড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট এবং অধুনাতম ইউএপিএ ইত্যাদি হাজার গন্ডা সন্ত্রাস ও উগ্রপন্থা বিরোধী আইনে অভিযুক্ত বন্দিদের অধিকাংশই নিরপরাধ সাধারণ নাগরিক— এ তথ্য বারংবার আদালতে প্রমাণিত হলেও 'কড়া রাষ্ট্রে'র প্রবক্তা তথা জাতীয় নিরাপত্তার অভিভাবকরা কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের অভিঘাত আটকাতে তৎপর হন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ঐ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে। ইউপিএ-ত্যাগী মমতা নানা ইস্যুতে কেন্দ্র-বিরোধিতায় কম্বুকণ্ঠ হলেও এক্ষেত্রে কেন্দ্রের সহগামী। রাজ্য সরকারের পক্ষে শীর্ষ আদালতে অভিযোগ— 'হাইকোর্টের রায়ে সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষিত সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদেরও রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর জেরে এবছর ৯ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে।

রাজবন্দির সংজ্ঞাবদল

আদালতে আইনি যুদ্ধেই থেমে থাকেনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় প্রণোদনায় এবং রাজ্যের উদ্যোগে এবছর আগস্টে ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট-এ রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা আমূল বদলে সংশোধনী আইন পাস হয়েছে রাজ্য বিধানসভায়। এই আইনে সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সংগঠনের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া না হলেও রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা থেকে 'নিষিদ্ধ, তালিকাভুক্ত ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং সমগোত্রীয় সংগঠনের সদস্য-সমর্থকদের' বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই সংজ্ঞা শুধু 'গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং গণবিক্ষোভের' সূত্রে ধৃতদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর এই তিন ধরনের আন্দোলনের চরিত্রলক্ষণ হবে 'মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা এবং সামাজিক সংস্কার'। এভাবে বাম আমলের আইনে বিধৃত রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা এবং তার ব্যাখ্যার উদার গণতান্ত্রিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়েছে। পুরনো আইনের ছয় নম্বর ধারার 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার'দের রাজবন্দির মর্যাদা দানের ব্যবস্থা ছিল। সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ ক্ষমতা-যুদ্ধে মমতা অহর্নিশ এহেন শাসকীয় প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছেন,

গোটা দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তিদানের দাবিতে কো-অর্ডিনেশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অর্গানাইজেশনস (সি ডি আর ও) আহূত কলকাতা কনভেনশনে (ফেব্রুয়ারি, ১৩) গৃহীত প্রস্তাবের দাবিসমূহ :

১. আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট, আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট, সিডিশন অ্যাক্ট এবং পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইত্যাদি বাতিল কর। সিপিআই (মাওবাদী) সহ বিভিন্ন সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও।

২. কুড়ানকুলামে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের নেতা-কর্মীবৃন্দ, জল-জঙ্গল-জমিন রক্ষার গণআন্দোলনগুলির নেতৃবৃন্দ— দয়ামণি বারলা, ড. সুনীলম, বিনায়ক সেন, সীমা ও বিশ্বজিৎ আজাদ, অরুণ ফেরেইরা প্রমুখদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহে উস্কানির মামলা প্রত্যাহার করো।

৩. গুরগাঁওয়ে মারুতি কারখানা থেকে আসানসোলে সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতা-কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করো।

৪. জনসাধারণের কমিটি নেতা ছত্রধর মাহাতো, সত্তরোর্ধ এসইউসিআই নেতা প্রবোধ পুরকায়েত, সত্তরোর্ধ মাওবাদী নেতা নারায়ণ সান্যাল, সুশীল রায়, গৌর চক্রবর্তী, পতিতপাবন হালদার সহ সমস্ত রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তি চাই।

৫. সমস্ত বিচারাধীন বন্দীর মামলা রাষ্ট্রপুঞ্জ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গাইডলাইন মেনে পর্যালোচনা করতে হবে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংশোধন করে দ্রুত বিচার এবং জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. মৃত্যুদণ্ড বাতিল করো।

৭. জম্মু কাশ্মীর সহ সর্বত্র ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা, সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে ধর্ষণ, অত্যাচার ও মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের অত্যাচার-বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন লাগু করতে হবে।

৮. জম্মু-কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ভারত, মধ্যভারতের আদিবাসী প্রধান অঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল থেকে ভারতীয় যৌথ ও আধা-সামরিক বাহিনি প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. সালওয়া জুড়ুম এবং অপরাপর সরকার-সমর্থিত বেসরকারি সেনা ভেঙে দিতে হবে।

১০. তথাকথিত উন্নয়নের নামে সমস্ত উচ্ছেদ বিস্থাপন বন্ধ করো।

১১. মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও থেকে পশ্চিমবঙ্গের মালদা পর্যন্ত গোটা দেশ জুড়ে সন্ত্রাস-সম্পর্কিত ভুয়ো মামলায় অভিযুক্ত নিরীহ মুসলিম যুবকদের মুক্তি চাই।

১২. একদা বন্দিমুক্তির পক্ষে এবং ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার বিরুদ্ধে কম্বুকণ্ঠ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় বিরোধী মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্রমাগত সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হও।

যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অতীব ন্যায্য। কিন্তু শাসকের গদিতে বসেই তিনি আইন থেকে ওই শব্দগুলিকেই মুছে ফেললেন। যেন তাঁর রাজত্বে রাজরোষে বন্দিদশার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। পুরনো আইনে 'ব্যক্তিগত লোভ ও অন্যান্য মতলব ছাড়া রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কৃত অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধ' বলে গণ্য করা হয়। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক অপরাধের সীমা বাড়িয়ে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত সকল অপরাধ তথা 'রাজদ্রোহে উস্কানি, রাষ্ট্রবিরোধী যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র' ইত্যাদি অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধের আওতায় আনা হয়। এমনকি সাধারণ খুন-জখম, ধর্ষণ ইত্যাদির অভিযোগও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে অভিযুক্তকে রাজবন্দির মর্যাদা প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া হয়। রাজনৈতিক অপরাধের শ্রেণী-বিশ্লেষণকে মাথায় রেখে এবং অতীতে ক্ষমতাসীনদের হাতে নির্যাতিত ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন তথা গরীব মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, মানবাধিকার রক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা- সম্পর্কিত স্বার্থরক্ষা ও অধিকারের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আন্দোলনে-সংগঠনগুলিকে 'গণতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করা হয়।

নেতৃস্থানীয় মানবাধিকার কর্মী গৌতম নভলাখা সম্প্রতি জানিয়েছেন, প্রয়াত কে জি কান্নাবীরনের মতো প্রবীণ আইনজ্ঞ এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতার পরামর্শ মেনে পশ্চিমবঙ্গের জেল আইনে রাজবন্দির সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা নির্ধারিত হয়। বামফ্রন্ট সরকার তার নিজের আইনে বর্ণিত এই উদার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা মেনে সরকার-বিরোধী বন্দিদের মর্যাদা দেয়নি। কিন্তু মমতা সরকারের সংশোধনী এই রাজ্য আইনে রাজবন্দির বিস্তৃত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সবটা মুছে দিয়ে নাগরিক অধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের অর্ধশতাব্দীর তিল তিল অর্জনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ক্ষমতাসীন তৃণমূলের নিরঙ্কুশ দলতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে এই সংশোধন শুধু একদা-বন্ধু মাওবাদীকুলই শুধু নয়, অপরাপর বিরোধীদেরও অগণতান্ত্রিক বলে ছাপ্পা মারার ব্যবস্থা করেছে। মজা হচ্ছে, বিধানসভায় সিপিএম তথা অন্যান্য বামশরিকরা এহেন অভিযোগ জানালেও এই সংশোধনীটির নাম কা ওয়াস্তে বিরোধিতা করেই তাঁরা ক্ষান্তি দেন। ক্ষমতায় ফিরতে পারলে এই সংশোধনের জোরে জ্ঞাতিশত্রু মাওবাদী এবং অপরাপর বৈরিদের মোকাবিলা সহজ হবে, সিপিএম নেতৃত্বের এমন অঙ্কই সম্ভবত ফ্রন্টের নমোনমো বিরোধিতার নেপথ্যে। কিন্তু তার আগে এই সংশোধনীর ফল তাঁদেরও ভুগতে হবে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব তথা মন্ত্রীরা অভয় দিয়েছেন : সংসদীয় গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাসীদের কোনও ভয় নেই। একদিকে রাজনৈতিক বন্দিদের স্বীকৃতির মূলে কুঠারাঘাত, অন্যদিকে বিচারাধীনদের দ্রুত বিচার এবং জামিনের দাবিতে কর্ণপাত না করা— দুইয়ে মিলে বছরের পর বছর পর জেলে পচিয়ে মারার ব্যবস্থা পাকা।

রাজ্যের জেলগুলিতে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক মিলিয়ে দশবছর পর্যন্ত বিচারাধীন বন্দি অগণ্য। কারা দপ্তরের ওয়েবসাইটের হিসেবই বলছে ৫ বছরের বেশি বন্দি ২৬৩ জন। তিন থেকে পাঁচ বছর— ৭২৫ জন। এটা ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরের হিসেব। গত বছর জুলাই-আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেলে এবং তার আগে কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর

রিভিউ কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্ট এবং সুপারিশের (ডিসেম্বর ২০১১) সংক্ষিপ্তসার

কমিটি বিভিন্ন কারণে জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির সুপারিশ করছে। পর্যায়ক্রমে মুক্তির পদ্ধতির ক্ষেত্রে সুপারিশ এরকম: প্রথমে অবিলম্বে জামিন এবং পরে সকল রাজবন্দির বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার এবং ইতিমধ্যে আইনি সংজ্ঞার ভিত্তিতে আইজি(কারা)-কে দ্রুত অন্তর্বর্তীকালীন স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ। কমিটির প্রথম ছয়মাসের মেয়াদপর্বে (তিনি কজনকে এমন স্বীকৃতি দিয়েছেন তার কোনও তালিকা বা সংখ্যা অবশ্য অনুল্লিখিত) সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে (শেওনন্দন পাসওয়ান এবং রাজেন্দ্র কে জৈন মামলা, ১৯৬৩) মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে রাজ্য ডিরেক্টর অব প্রসিকিউশনকে অনুরোধ করা হচ্ছে। আদালত-স্বীকৃত ৭৮ জন রাজবন্দীর অবিলম্বে জামিনে মুক্তি এবং তাঁদের ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে সরকারকে বিবেচনার সুপারিশ। আলিপুর জেলে বন্দি তিন বন্দি গৌরহরি মণ্ডল, রাধেশ্যাম গিরি এবং সঞ্জয় মান্ডি ওরফে প্রকাশ নুনিয়া-র ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী জামিন ও মামলা প্রত্যাহারের জন্য কমিটির সুপারিশ। এ হেন সুপারিশ সত্ত্বেও বহু কেন্দ্রে জামিনে মুক্ত অভিযুক্তদের আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র দফতরকে অনুরোধ, তাদের যেন পরবর্তী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত ওই হাজিরা না দিতে হয়। এ পর্যন্ত রাজবন্দির স্বীকৃতি চেয়ে ১৫০টি আবেদন এসেছে। আরও কিছু আসছে। সংশ্লিষ্ট মামলাগুলির বিশদ চেয়ে পাঠানো হয়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য মামলাগুলি প্রত্যাহারে সুপারিশ। নন্দীগ্রামে সম্পত্তি নষ্ট সংক্রান্ত ৭৫টি দায়রা মামলার মধ্যে ২৮টি প্রত্যাহারের পরামর্শ। বাকি ৪৭টিতে আরও পর্যালোচনা। শারীরিক আঘাতে ইত্যাদি সংক্রান্ত ৯৭টি দায়রা মামলার মধ্যে আইনে বাধা না থাকলে ২৭টির ক্ষেত্রে প্রত্যাহার, ৫২টিতে আরও পর্যালোচনা। ১২টিতে পুলিশ (তথ্যপ্রমাণ না দিতে পারায়) ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়ায় মামলাগুলি তুলে নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য। ছয়টি মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত সিবিআই ও সিআইডির তদন্ত রিপোর্ট পেলে সিদ্ধান্ত হবে। অন্য ৩০টি সেসন মামলার ১৩টি প্রত্যাহার এবং বাকি ক্ষেত্রে আরও খতিয়ে দেখার সুপারিশ।

জেলে বন্দিদের অনশন-আন্দোলন বিচারবিভাগ বা সরকার, কারও ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। প্রেসিডেন্সিতে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক বন্দিদের অনশন পর্বে বন্দিমুক্তি কমিটি এবং এপিডিআর-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন জেল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি পাঠান কমিশন প্রধান তথা সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গাঙ্গুলি। বিনা বিচারে আটক রাখা ও বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বন্দিদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার খর্বিত এবং তা ন্যায়বিচারের নীতির পরিপন্থী, কমিশনের এই বক্তব্য হাইকোর্টকে বিচারে দ্রুতি আনায় কোনও সক্রিয় হস্তক্ষেপে প্রণোদিত করতে পারেনি এখনও। অথচ হাইকোর্টের বিচারপতিরাই ১৯৮০-৯০-এর দশকে একের পর এক মামলায় বিচার-বিভাগীয় সক্রিয়তার মাধ্যমে কারান্তরালের বহু মর্মান্তিক কাহিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, বন্দিদের অধিকারের সীমা সম্প্রসারণ এবং তার দৈনন্দিন প্রয়োগে নজরদারির ব্যবস্থা করেছেন। বাম জমানার ধারাবাহিকতায় তৃণমূল সরকারও বন্দিদের আন্দোলনকে দমন করেছে। পুলিশি তদন্তে ঢিলেমি, সরকারি উকিলদের গয়ংগচ্ছ মনোভাব, সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে বিচারে বিলম্বের ঐতিহ্য এতটুকু বদলায় নি। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে জেলেই মারা যান অসুস্থ ইউএপিএ বন্দী *পিপলস মার্চ* পত্রিকার সম্পাদক স্বপন দাশগুপ্ত।

ঘোর প্রত্যাশা জাগিয়ে পরিবর্তন এলেও শাসকীয় ক্ষমতার রাজনীতি বদলায় নি। মমতা সরকার রিভিউ কমিটির সুপারিশ মেনে দণ্ডিত বৃদ্ধদের অনেককে ছাড়লেও সত্তরোর্ধ ও গুরুতর অসুস্থ মাওবাদী মুখমাত্র গৌর চক্রবর্তী বা পতিতপাবন হালদারের মতো বৃদ্ধ মাওবাদী নেতারা মানবিক ছাড়ের যোগ্য বলে বিবেচিত হননি। এসইউসিআই নেতা প্রবোধ পুরকায়স্থের মতো অপরাপর প্রবীণ বন্দীও তালিকায় ঠাঁই পাননি। উল্টে বেড়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। রাজ্য সরকার মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছত্রধর মাহাতো, সুখশান্তি বাস্কে, সুদীপ চোংদার, প্রসূন চ্যাটার্জি, রাজা সরখেল, ধৃতিরঞ্জন মাহাতো, প্রশান্ত পাত্র, কল্পনা মাইতি প্রমুখকে (অধিকাংশই রাজবন্দি হিসাবে আদালতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত) রাজ্যের বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করেছেন। কারা-কর্তাদের আড়ালের দাবি, এরা নাকি জেল ভেঙ্গে পালানোর ছক কষছিলেন। তবে প্রকাশ্যে একে 'রুটিনমাফিক ট্রান্সফার' বলে দাবি করেছেন কারা বিভাগের আইজি। ওই রাজবন্দিদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনেও মামলা চলছে। অধিকাংশই অন্যান্য মামলায় আদালত জামিন বা খালাস পেয়েছেন। প্রায় পাঁচ বছর জেলে বিচারাধীন থাকার পর 'কেস কানেকশন'-এর নাগপাশ যখন অনেকটা খুলেছে, তখন হঠাৎ এরা জেল পালাতে যাবেন কেন? বন্দীমুক্তি কমিটি, এপিডিআর এবং কমিটি ফর দি রিলিজ অফ পলিটিক্যাল প্রিজনারস এই বন্দিদের পরিবার-বন্ধু থেকে দূরে রেখে জেল-বদলির নেপথ্যে সরকারি দলের প্রতিহিংসাকেই দায়ী করেছে। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাসিন্দা ছত্রধর ও সুখশান্তিকে পাঠানো হয়েছে যথাক্রমে আলিপুর ও বাঁকুড়া জেলে, কলকাতার ছেলে প্রসূন ও রাজাকে যথাক্রমে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায়।

এর সঙ্গে চলেছে জেলের ভিতরে বা কোর্টে পুলিশের লক-আপে উস্কানিতে অপরাপর বন্দিদের হাতে রাজবন্দিদের হেনস্থা, দমনপীড়ন। অভিষেক মুখার্জি, সুনীল মন্ডল এবং সুভাষ রায় প্রেসিডেন্সি জেলের এই তিন রাজনৈতিক বন্দীকে শিয়ালদা কোর্টে কিছু সাধারণ বন্দি প্রবল মারধোর করে রক্ষী পুলিশের প্ররোচনায়। স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানিয়েও কোনও তদন্তের প্রতিশ্রুতি বা এধরনের নিগ্রহ বন্ধের কোনও আশ্বাস পায়নি এপিডিআর। সাত বছর জেলে কাটানোর পর এবং চণ্ডী সরকার ও আরও কয়েকজন একটি মামলায় বেকসুর খালাস পেলেও বৃদ্ধ চণ্ডীবাবু মাওবাদীদের সংগঠিত করতে সক্রিয়, এহেন অভিযোগে তাঁকে ফের জেলে ঢোকানোর সরকারি তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। সব্যসাচী গোস্বামী ও জাকির হোসেন পাঁচ বছর পর আদালতের নির্দেশে মুক্তি পাওয়ায় ফের তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে একই অভিযোগে। আদালতে তাঁরা শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও করেছেন।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার জেলে বিচারাধীন ও দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দির সংখ্যা কত, কারা দফতরের ওয়েবসাইটে সে তথ্য মেলেনি। আগেই বলেছি, রাজনৈতিক বন্দির অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় না সরকারি সাইট বা অন্যত্র। মানবাধিকার সংগঠনগুলিও ধারাবাহিকভাবে এহেন বন্দিদের তালিকা রাখে না। এ বছরের গোড়ায় প্রকাশিত 'বন্দীমুক্তি কমিটি'র অসম্পূর্ণ তালিকা অনুযায়ী স্বীকৃত ও অস্বীকৃত মিলিয়ে রাজবন্দি ১৮০জন। এরমধ্যে ১১৮ জন মাওবাদী ও জনসাধারণের কমিটির সদস্য-সমর্থক। এসইউসিআই সদস্য-সমর্থক ৪৬ জন। (সারণি দ্রষ্টব্য) এর সঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গ্রেফতারগুলিকে যোগ করলে মোট বন্দির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। দার্জিলিং-এ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতৃত্বকে উদ্ধৃত করে বন্দীমুক্তি কমিটির হিসেব, অন্তত ২২০০ জন গজমুমু সমর্থককে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার করা হয়। এদের অনেকে ছাড়া পাবেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন মোকাবিলায় পুলিশ-আদালত-জেলের ব্যবহারের শাসকীয় রাজনীতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় তৎপর একদা রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার অধুনা 'রাফ অ্যান্ড টাফ' মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে রিভিউ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের দাবি তুলেছেন এপিডিআর, বন্দিমুক্তি কমিটি, মাসুম, সিপিডিআরএস, সিআরটিপি, মানবাধিকার সংহতি, সিআরএস প্রমুখ সংগঠন। একই দাবি করেছেন কমিটির প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত ও সদস্য সুজাত ভদ্র। সরকার কানে তোলেনি। সরকার

না করলে বেসরকারি সদস্যরা কি তা প্রকাশ করে দেবেন? উত্তরটা জরুরি।

গণতন্ত্রের বন্ধুরা

মমতার এই ভোলবদলকে কী চোখে দেখছেন সরকার-ঘনিষ্ঠ এবং অধুনা সমালোচনামূলক সমর্থনের প্রবক্তারা? 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্রাসি' সংগঠনের 'পরিবর্তন : ফিরে দেখা' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে তার হদিশ মিলবে। তৃণমূল সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জুলাইতে প্রকাশিত পুস্তিকাটির যুগ্ম সম্পাদক সুজাত ভদ্র ও অশোকেন্দু সেনগুপ্ত। সুজাতবাবু বন্দিমুক্তি সংক্রান্ত রিভিউ কমিটি ও মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তি-উদ্যোগ সম্পর্কিত কমিটির সদস্য ছিলেন। অশোকেন্দুবাবু দ্বিতীয় কমিটিতে যুক্ত ছিলেন। গণতন্ত্রের বন্ধুদের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির সালতামামির সবটা এই প্রবন্ধের পরিসরে ধরা সম্ভব নয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আমি সীমাবদ্ধ থাকব মূলত এরাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলনের উজ্জ্বলতম মুখ সুজাতবাবুর বক্তব্যে। তার আগে পুস্তিকাটিতে মানবাধিকার ও বন্দিমুক্তি প্রশ্নে এফওডি সংগঠনের সামগ্রিক মূল্যায়নটি তুলে ধরছি। 'আমাদের বিবেচনায় থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়—প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও মন্তব্য' শীর্ষক তালিকাটি কার্যত একনজরে সরকারের মার্কশিট বা রিপোর্ট কার্ড। প্রাসঙ্গিক অংশটি নিচে দেখুন—

সুজাতবাবু গোড়াতেই তাঁর সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন তাঁর বক্তব্যে। "সিপিএম তথা বামফ্রন্ট যাতে অষ্টমবারের মতো সরকার গঠন না করতে পারে" এই লক্ষ্যে "নো টু সিপিএম" ডাক দিয়ে "স্থিতাবস্থার ব্যাধি" থেকে মুক্তির পক্ষে 'দ্বিধাহীন, দ্ব্যর্থহীন' ভাবে 'সক্রিয়তা' দেখায় এফওডি। অন্যদিকে তাঁদের বিরোধী মানবাধিকার কর্মীরা "মেকি বামপন্থীদের প্রস্থানকে জরুরি ও প্রাসঙ্গিক" বলে ঘোষণা করলেও বা "নৈতিক অবস্থান" নিলেও রাজনৈতিক "সক্রিয়তা" 'দেখাননি। তিনি লিখেছেন, "হয়তো তারা মনে মনে একটি আশা পোষণ করেছিলেন, কম মার্জিনে হলেও বামফ্রন্ট সরকারই অধিষ্ঠিত হবে এবং যথারীতি ক্ষমতাসীন মেকি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন চলবে; পূর্বের মতো এক কক্ষপথে ঘুরপাক খাবে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ তাদের গুপ্তসুপ্ত বাসনা পূরণ করলেন না; বিপুলভাবে সিপিএমকে পর্যদুস্ত করলেন, ক্ষমতা থেকে সরালেন। ব্যস, রাগ-ক্রোধ এসে পড়ল অপাত্রের উপর।" শুধু তাই নয়, "এফওডি যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুকের সাথে এও লক্ষ্য করেছে যে "রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সক্রিয়তা যাঁরা দেখালেন না, তারাই নতুন সরকারের প্রথম দিন থেকে, এমনকি আগে থেকেই নানা জাতীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-কটাক্ষ-সমালোচনা শুরু করেছিলেন, তাঁরাই হঠাৎ কয়েকমাস পর থেকেই বলতে শুরু করলেন, তারা সরকারের দ্বারা 'প্রতারিত' বোধ করছেন, ভান করলেন তাঁরা যেন বিপুল তথা আমূল পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন নাকি এই পটপরিবর্তন বাংলাকে 'সোনায় মুড়ে' দেবে।" এর বিপরীতে এফওডি তথা গণতন্ত্রের বন্ধুরা "চেষ্টা করে আসছে উচ্ছ্বাস, আবেগ বা কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি বিবর্জিতভাবে নতুন সরকারের কার্যকলাপকে পর্যালোচনা করতে; যখনই মনে হয়েছে গণতন্ত্র আক্রান্ত হয়েছে, যখনই মনে হয়েছে সরকারি সিদ্ধান্ত জনবিরোধী, তখনই এফওডি সাধ্যমতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানিয়েছে।"

সুজাতবাবুর বক্তব্যের নির্যাস এটাই— সিপিএম বিতাড়নে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকার জোরে তৃণমূল সরকারের অন্যায়, ভুলক্রটির সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার তাঁদেরই। তাঁদের সমালোচকরা সকলেই ছদ্ম সিপিএম-বিরোধী। পরিবর্তনকালে রাজনৈতিক শিবির বেছে নিতে অপারগ-অস্বীকৃতরা সে অধিকার কার্যত হারিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এফওডি-র সিপিএম-বিরোধিতা রাজনৈতিক হলেও এখন বর্তমান সরকারের প্রতি তাঁদের সমালোচনা "রাজনৈতিক অভিসন্ধি বিবর্জিত" তথা বিদ্বেষরহিত এবং মাত্রাজ্ঞান সম্পন্ন। অনেকে সুজাতবাবুর বক্তব্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'আমরা-ওরা' (বুশ-তত্ত্বের ধরতাইও আসতে পারে) তত্ত্বের প্রতিধ্বনি শুনতে পারেন। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ থেকে বাঁচিয়ে মানবাধিকার আন্দোলনের আদর্শ-লক্ষ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রবক্তার ক্ষমতা দখলের আবিলতায় যুক্ত বিশেষ রাজনৈতিক নেত্রী ও তাঁর সরকারের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে তন্নিষ্ঠতায় কর্তিত-লাঙ্গুল

প্রত্যাশা	প্রাপ্তি	মন্তব্য
৩। **মানবিক** ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত অধিকার ও **আইন প্রয়োগের** নিশ্চয়তা। দানবীয় নির্বতনমূলক আইন প্রয়োগে **পূর্ণ** বিরতি।	হয়নি	হতাশাজনক; নির্বাচনী প্রতিশ্রুত পালিত হয়নি।
৪। **জঙ্গলমহল** থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করে আলোচনার উপযোগী **গণতান্ত্রিক পরিবেশ** রচনা এবং সর্বত্র রাজনৈতিক হিংসা ও সংঘর্ষ রোধে **পরিকল্পনা** রচনা। রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তিদান।	হয়নি	হতাশাজনক/ব্যতিক্রম NCTC

নীলকান্ত শৃগালের গল্পও মনে করাতে পারে। কিন্তু আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই বন্ধু-সমালোচকের সরকার-মূল্যায়নেই নজর দেব।

সুজাতবাবুর প্রবন্ধ 'পরিবর্তনের বছরগুলিতে মানবাধিকারের হালহকিকৎ' বিশদে বর্ণিত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-নেতাই-এর পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে গণতন্ত্রের বন্ধুরা ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন বিরোধী নেত্রীর বিবেচনার জন্য একটি দাবি সনদ পেশ করেন। ভদ্রের কথায়, "স্বীকার্য, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে কিছু কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। আবারও এটাও স্বীকার্য, রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্তে মুক্তির প্রশ্নে অথবা যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের প্রশ্নে স্পষ্ট, স্বচ্ছ কোনো অবস্থান জানায়নি।" এরপর মমতার নির্বাচনী ইস্তেহার উদ্ধৃত করে তিনি প্রতিশ্রুতিটি উল্লেখ করেছেন— "রাজনৈতিক বন্দিদের ক্ষেত্রে রিভিউ কমিটি গঠন করে দেখা হবে তাঁরা শাস্তি পাওয়ার মতো অপরাধ করেছেন, নাকি প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।" এছাড়াও 'বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দীদের দ্রুত মুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা', 'অ-রাজনৈতিক' বিচারাধীন কয়েদির ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ', 'গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও মানবাধিকারকে যথাযথ গুরুত্ব ও প্রাধান্য' ইত্যাদি প্রশ্নে তৃণমূলের ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতির কথাও সুজাতবাবু উল্লেখ করেছেন।

ভোটের পর মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্তে রিভিউ কমিটি গঠনের উল্লেখ করে তিনি মনে করাতে ভোলেননি— "গণআন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও তিক্ত বিতর্ক শুরু হয় দুটি শর্ত নিয়ে এবং কমিটির বিন্যাস নিয়ে।" এরপর 'চূড়ান্ত বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে কাজ করেও' কমিটি ডিসেম্বর ২০১১ এবং অগস্ট ২০১২ সালে সরকারের কাছে সুপারিশসহ দুটি রিপোর্ট পেশ করে। সরকারের কাছে, রিভিউ কমিটি 'শর্তবিহীনভাবে' বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তির সুপারিশ করেছে। একইসঙ্গে ৩-১৪ বছর পর্যন্ত বিচারাধীন 'অ-রাজনৈতিক বন্দি'দেরও মুক্তির সুপারিশ রয়েছে। এরপর ভদ্রের মন্তব্য— "দুঃখজনক হলেও সত্যি, সরকার সুপারিশের সামান্য অংশ কার্যকর করেছে।" এই প্রসঙ্গে তিনি নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের ফৌজদারি মামলাগুলি এবং জাঙ্গিপাড়ার ৫০টির মতো মামলা প্রত্যাহারের সরকারি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে উত্তরবঙ্গের ৫০ জন রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির সিদ্ধান্ত এবং নন্দীগ্রামের তিনজন 'মাওবাদী'র বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার কথা। কিন্তু তিনি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন— "লালগড়ে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত ছত্রধর মাহাতো সহ অসংখ্য ব্যক্তি গাদা গাদা মামলায় বন্দি হয়ে আছেন। সরকার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। ইউএপিএ-র মতো কালাকানুনে পূর্বতন সরকারের আমলে ১০০ জন ধৃত। বহুজন আজও বন্দি; এই নতুন সরকারও কয়েকজনকে ইউএপিএ-তে বন্দি করে রেখেছে। এছাড়া, নিয়মিত ব্যবধানে জঙ্গলমহল থেকে 'মাওবাদী' সন্দেহে গ্রামবাসীদের গ্রেফতারি নীতি পূর্বতন সরকারের মতই চলছে।"

এহেন পর্যবেক্ষণের পর তাঁর সমালোচনা— "এই সার্বিক প্রেক্ষাপটে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার ও পরিবেশ রক্ষা ও সম্প্রসারণের প্রশ্নে ব্যর্থ শুধু নয়, নানা সময়ে সঙ্কোচনের চেষ্টাও করেছে। যৌথবাহিনী প্রত্যাহার না হলে জঙ্গলমহলে প্রকৃত শান্তি ফিরবে না। ছত্রধরদের নিঃশর্তে মুক্তি না দিলে জঙ্গলমহলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রশমিত হবে না। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবি একটি গণতান্ত্রিক দাবি। সরকারের সেই দাবি মানা উচিত।" সরকার যে বৃহত্তর গণতন্ত্রের প্রশ্নে মিত্রস্থানীয়, বন্ধুভাবাপন্ন নাগরিক সমাজের কথাও কানে তুলছেন না, সে আক্ষেপও সুজাতবাবু ও তার সহগামী গণতন্ত্রের বন্ধুদের মূল্যায়নে স্পষ্ট। সরকারের কাছে তাদের অপ্রাপ্তির তালিকা বেশ লম্বা। সুজাতবাবুর নিজের উল্লেখ্য ঘটনা বা ইস্যুগুলির মধ্যে রয়েছে— নন্দীগ্রামে অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা করায় সিবিআই-কে অনুমতি প্রশ্নে টালবাহানা, ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা রোধে সরকারি তৎপরতার অভাব, ধর্ষিতা মহিলার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ, 'প্রশ্ন করলেই গ্রেফতার, হাজতবাস বা ন্যূনতম পক্ষে চরম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ', কামদুনি ও অন্যান্য ধর্ষণ-হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিন্দনীয় ব্যবহার, দুবছরের মধ্যে ছয় দফা পুলিশি গুলিচালনা ও মৃত্যু, ধনেখালিতে পুলিশ হেফাজতে তৃণমূল কর্মী নাসিরুদ্দিনকে পিটিয়ে হত্যা ও এসএফআই কর্মী সুদীপ্ত গুপ্তের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় দায়সারা বিবৃতি, মানবাধিকার সংগঠন সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের সভা-সমিতি-মিছিলে কার্যত নিষেধাজ্ঞা, ধর্মতলায় শাসক দলের সভার মৌরসিপাট্টা, বালির পরিবেশকর্মী তপন দত্ত ও সুঁটিয়ার গুণ্ডারাজ-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক বরুণ বিশ্বাসের হত্যার তদন্তে ঢিলেমি, সরকারি গ্রন্থাগারের তালিকা থেকে অপছন্দের পত্রপত্রিকা ছাঁটাই, ধর্মঘট বা বন্‌ধ সমর্থকদের আর্থিক ও অন্যান্য শাস্তি ইত্যাদি।

ফেল করা ছাত্রীর ভালো গ্রেড

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে 'পূর্বতন সরকারের ধারাবাহিকতাকেই বহন' করার কারণে সুজাতবাবুর মূল্যায়ন— "নতুন সরকারকে পাস মার্ক দেওয়া যাচ্ছে না, ফেল করাতেই হচ্ছে।" কিন্তু এটাই তাঁর সম্পূর্ণ মূল্যায়ন নয়। তিনি 'পরিবর্তনের সরকারকে ভালো গ্রেড-সহ পাশ-মার্ক' দিয়েছেন মূলত সরকারের অর্থনৈতিক নীতিগুলির জন্য। এই তালিকায় রয়েছে— বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ না করার নীতি বারবার ঘোষণা, নয়াচরে কেমিক্যাল হাব বাতিল, রাজ্য সেজ আইন বাতিল, হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ

কেন্দ্র বাতিল, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ বিরোধিতা, জিন পরিবর্তিত সোনালি ধান চাষে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা, সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরানোর আইনি উদ্যোগ, পূর্ব কলকাতায় জলাভূমি দখল আটকানোর আইনি প্রচেষ্টা এবং একাধিক গণহত্যা কাণ্ডের তদন্তে কমিশন গঠন ও জেলাভিত্তিক মানবাধিকার আদালত গঠন। এইসব প্রশ্নে নতুন সরকারের 'সদর্থক অবস্থান'-এর কারণে 'সরকারকে ভালো নম্বর' দেওয়ার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে সুজাতবাবু প্রয়াত *অনীক* সম্পাদক তথা 'পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার আন্দোলনের অতি পরিচিত নাম, তথা অ-দলভুক্ত বাম বুদ্ধিজীবী বলে সম্মানিত, সদ্য প্রয়াত দীপংকর চক্রবর্তী'-র বক্তব্য টেনেছেন সুজাতবাবুর বয়ানে। (যেটা তিনি উল্লেখ করেননি তা হল দীপংকরবাবু এপিডিআর-এর অভ্যন্তরীণ বিতর্কে তাঁর অন্যতম প্রতিপক্ষ ছিলেন।) যার মোদ্দা কথা হল, 'মানবাধিকার প্রশ্নে সরকারের সদর্থক পদক্ষেপকে দ্বিধাহীন অভিনন্দন' এবং 'মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী পদক্ষেপের নিন্দা এবং বিরোধিতায় অবিচল আন্দোলন। এই অবস্থানের আপাতগ্রাহ্যতা (কেননা সরকারি নানা নীতি ভিতরে-বাইরে নানা স্বার্থ, লবির চাপে-তাপের ফসল যা অনেকক্ষেত্রে খণ্ডিত, পরস্পরবিরোধী ও বিভ্রম সৃষ্টিকারী। কিন্তু শেষপর্যন্ত একটি সামগ্রিক পূর্বাপরতা বা ধারাবাহিকতা রাজনীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভূমিকা পর্যবেক্ষকরা খুঁজে থাকেন) মেনে নিয়েও কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন রাখছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি ও খুচরো ব্যবসা ইত্যাদি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সমর্থক নাগরিক সমাজের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মোটের উপর সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু 'ভালো' অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন কী 'খারাপ' রাজনৈতিক বা মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতি-দর্শনের বিকল্প হতে পারে? মমতার কৃষক, কৃষি এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের প্রতি মমত্ব কতটা নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির উন্নয়নী মডেলের বিরোধিতা-প্রসূত, কতটা বা ভোটের রাজনীতির অঙ্ক-নির্ধারিত সে বিতর্ক গণ-রাজনীতির পরিসরে এই মুহূর্তে প্রধান বিচার্য নয়। কর্পোরেট হৃদয়-সম্রাট ও আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের প্রবক্তা নরেন্দ্র মোদী তথা সঙ্ঘ পরিবার বনাম বাজার-বিপ্লবীদের এতকালের আস্থাভাজন কংগ্রেসি পরিবারতন্ত্রের আম-আদমি প্রেমের দ্বৈরথপর্বে আঞ্চলিক শাসকদের অবস্থানের ভিন্নতা জল-জঙ্গল-জমিন বাঁচানোর আন্দোলনগুলির পক্ষে কিছুটা স্বস্তিদায়ক হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে নিকেশ করে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধির গল্প যে সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক তা তো বিশ্বের ইতিহাসে বারংবার প্রমাণিত। অন্যদিকে রয়েছে বহু-চর্চিত দলতন্ত্র কায়েমে সিপিএম-এর স্থূল অনুকরণ এবং বিরোধ-সমালোচনার ন্যূনতম সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিসরটুকু গিলে ফেলার উৎকট প্রচেষ্টা। এবং সিপিএম-এর দলতন্ত্র থেকে একধাপ এগিয়ে একনায়কতান্ত্রিক ব্যক্তিপূজার ফ্যাসিবাদী-প্রবণতা। সম্প্রতি কেন্দ্রের অনুকরণে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে প্রাক্তন ডিজি-কে সদস্য করে সরকারের সমালোচনামূলক সুপারিশগুলো আটকানোর পথে হেঁটেছেন মমতা। এহেন উদাহরণ দ্রুত বাড়ছে। এরপরও 'ভালো গ্রেডসহ পাস-মার্ক' কি পরীক্ষকের প্রলম্বিত বিভ্রম, না সচেতন ভাবের ঘরে চুরি? বিশেষ করে পরীক্ষক যখন মানবাধিকার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়, তখন তাঁর 'সাবজেক্টে' ডাহা ফেল-মারা ছাত্রীকে অপরাপর বিষয়ে 'ভালো গ্রেড' প্রদান সমালোচনা ও প্রশংসার ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা বলে প্রতিভাত হতে পারে।

যে প্রশ্নগুলি আজও উত্তর খোঁজে

নতুন সরকারের অভিষেকের অব্যবহিত আগে ও পরে রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি, রিভিউ কমিটি গঠন, তার বিচার্য বিষয়গুলি তথা সরকারি 'টার্মস অব রেফারেন্স' নিয়ে রাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ তিক্ত বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে পর্যবসিত হয়। তার রেশ এখনও রয়েছে। যে নীতিগত প্রশ্নগুলিতে আলো পড়লে বা মীমাংসা হলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকরা উপকৃত হতেন তা হলো— সরকার, শাসক ও বিরোধী দল বা দুপক্ষের বৃহত্তর শিবিরের সঙ্গে মানবাধিকার আন্দোলন-সংগঠন তথা নাগরিক সমাজ এবং সরকার ও দলনিরপেক্ষ গণ-রাজনৈতিক পরিসরের ভেদরেখা রক্ষা কতটা জরুরি এবং কীভাবে তা সম্ভব? নাকি এমন পরিসরের ভাবনা আকাশকুসুম মাত্র, শিবিরভুক্তিই সক্রিয়তার একমাত্র পথ? স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যে জনপ্রিয় সরকার ও নয়া শাসকদলের উত্থান, তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিপুল জনতার জড়িয়ে থাকা অনস্বীকার্য। কিন্তু ভুয়োদর্শী, ইতিহাসপ্রাজ্ঞ নয়া জমানার প্রধান কুশীলবদের রাজনৈতিক-সামাজিক উৎস ও এতাবৎকালের ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপসহীনতায় বিশ্বাসীদের ভূমিকা কী হবে? লঙ্কায় যে যায়, সেই হয় রাবণ— লোক অভিজ্ঞতার এই কালজয়ী নির্যাস তো তাঁরা ইতিহাসচর্চা এবং সমাজ-অনুশীলনে গভীরভাবে জানেন। না, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ' লেখার কথা বলছি না। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে হোক বা সমাজতন্ত্রের নানা ফলিত অভিজ্ঞতায় ক্ষমতালাভের পর বিরোধী-পর্বের গণতন্ত্র-কাতরতা, তাবৎ নিপীড়িতের সাথে আত্মীয়তার অঙ্গীকার ভুলে শাসকধর্মের জয়গাথা এবং একদা বন্ধুদের উপর হিংস্র আক্রমণ কি নতুন ঘটনা? এরপরও দলভুক্ত কপিত্থের ন্যায় আচরণ বা স্রোতে ভেসে যাওয়া অনিবার্য? এভাবেই কি মাটির কাছাকাছিথাকা যায়? পুরনো স্বৈরাচারীদের প্রত্যাবর্তনের পথ আটকাতে নবোদ্ভিন্ন স্বৈরাচারের কুললক্ষণ ভুলে দুরাশা-আশঙ্কার দোলাচলে দোলাই কি তবে নাগরিক সমাজ তথা গণতন্ত্রের বন্ধুদের ভবিতব্য?

প্রশ্নগুলি নতুন নয়। ৩৭ বছর আগে ইন্দিরা স্বৈরাচারের বিরোধিতায় পুনরুজ্জীবিত নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অন্যতম ফসল পিইউসিএল ভাঙ্গে জরুরি অবস্থা পরবর্তী 'বন্ধু' জনতা সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে। সেদিনের বন্ধুরা তখন অনেকেই মন্ত্রী। গণতন্ত্রের যুদ্ধে জয়ী সরকারের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্ষমাসুন্দর বা ঢোঁক-গেলা সমালোচনার যারা বিরোধী, তাদের বিপক্ষে উঠেছিল ইন্দিরা-শাহী ফেরার পথ সুগম করার অভিযোগ। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আমরা ভঙ্গবঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি দেখেছি। তৃণমূল সরকারের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে যে বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয় রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির ইস্যুতে। এতকালের সহযোগীরা পরস্পরকে বিদ্ধ করলেন তৃণমূলের কাছে আত্মবিক্রয় বা সিপিএম-এর সঙ্গে গোপন আতাতের অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্থ হল আন্দোলনের ঐক্য ও কর্মীদের মনোবল এবং বিভ্রান্ত হলেন সমর্থক-শুভার্থীরা। গণমাধ্যমে তা চাউর হতে সময় লাগেনি। "বন্দিমুক্তি আন্দোলনের উজ্জ্বল ঐতিহ্য এক চরম নিন্দাযোগ্য বিভ্রান্তি ও সংশয়ের মুখোমুখে দাঁড়িয়ে অনেকটাই ম্লান হয়ে গেল।"— এপিডিআর মুখপত্রে 'অধিকার'-এ এবছর জানুয়ারি মাসে একথা লিখেছেন প্রয়াত দীপংকর চক্রবর্তী। সম্ভবত মৃত্যুর আগে এটাই তাঁর শেষ লেখা। দুপক্ষের প্রধান কুশীলবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতটাই বিষিয়ে উঠল যে কিষেনজি হত্যায় সুজাতবাবুদের ভূমিকার অভিযোগ উঠল। কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এহেন প্রকাশ্য কালিমালেপন এর আগে দেশের মানবাধিকার আন্দোলনে ঘটেনি। আজাদ হত্যার পর স্বামী অগ্নিবেশকে কেন্দ্র করেও এহেন গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই মাওবাদী নেতৃত্বও এমন অভিযোগ করেননি। তবু কাদা ছোঁড়াছুড়ি চলল। অবশ্যই এ দায় কোনও একপক্ষের নয়। কিন্তু দায় বিচারের শব ব্যবচ্ছেদ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মানবাধিকার আন্দোলনে দীর্ঘকালীন নীতিগত বিতর্কগুলির একাংশ পরিস্থিতির প্ররোচনায় কীভাবে বারংবার উঠে আসে তার অমীমাংসিত চাপা পড়া ক্লেদ ও গরল নিয়ে, সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণই এ প্রসঙ্গ অবতারণার উদ্দেশ্য।

সমস্যাটা শুধু নির্বাচিত সরকারগুলির সঙ্গে গণসংগঠন-আন্দোলনের সম্পর্ক, আলাপ-আলোচনা, দর-কষাকষি ঘিরে নয়। অন্ধ্রে এপিসিএলসি ভেঙ্গেছে কে বালাগোপালের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পাশাপাশি অ-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিশেষত মাওবাদী হিংসার সমালোচকদের সঙ্গে মাওবাদী সমর্থকদের তীব্র মতবিরোধের জেরে। শুধু অন্ধ্র নয়, কাশ্মীর থেকে মণিপুর, ছত্তিশগড় থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় হিংসার পাশাপাশি তার সশস্ত্র প্রতিস্পর্ধী দল ও গোষ্ঠীগুলির হিংসা, বিশেষত অসামরিক আমজনতার জীবনে নিদারুণ বাস্তবতা। দুই হিংসার প্রতিযোগিতার বিভীষিকার এক তুল্যমূল্য দায় নিয়ে গোটা দেশের মানবাধিকার আন্দোলনে বিভাজন ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের 'সন্ত্রাসবাদী' ধারাকে ঘিরে এই বিতর্ক প্রথম দানা বাঁধলেও আমাদের ঔপনিবেশিক কালে উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের মতো রাষ্ট্রশক্তি এবং সশস্ত্র বিদ্রোহী-বিপ্লবীদের দীর্ঘকালীন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে তত্ত্বের আসর ছেড়ে বিতর্কগুলির অভিঘাত এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নেমে এসেছে। মাওবাদী দল সহ অপরাপর সশস্ত্র বিদ্রোহী-বিপ্লবীদের দ্বারা মানবাধিকার হনন, যুদ্ধাপরাধ এবং গণতন্ত্র হরণের ঘটনা ও প্রবণতা সম্পর্কে নীরবতা বা দায়সারা নিন্দা জঙ্গলমহলে ও অন্যত্র রাজবন্দিদের মুক্তির দাবির নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করেছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে জনমত গঠন করতে হলে রাষ্ট্রীয় হিংসা-সন্ত্রাসের সমর্থনবাচক প্রতর্কগুলির যথাযোগ্য জবাব দিতে হবে। স্ববিরোধিতা বা এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই। জিহাদি সন্ত্রাস এবং অপরাপর অরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে কখনও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অনিবার্য প্রত্যুত্তর বা কখনও তা মানবাধিকার এবং বন্দিমুক্তি আন্দোলনের বিষয় নয় বলে এড়িয়ে গিয়ে অভ্যান্তরীণ বিতর্কগুলিকে ঠাণ্ডাঘরে পাঠানোর দিন ফুরিয়েছে। নিঃসন্দেহে এসব বিষয়ে বিতর্ক-বিশ্লেষণ ও অবস্থান গ্রহণ প্রবাদোক্ত পাণ্ডোরার বাক্স খোলা বা মাইনবিছানো যুদ্ধক্ষেত্রে হাঁটার সামিল। কিন্তু সে ঝুঁকি না নিলে মানবাধিকার ও বন্দীমুক্তি আন্দোলন কখনই জনমনে গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বজনীনতা অর্জন করবে না। সরকার-মুখাপেক্ষিতা এবং মতাদর্শগত অন্ধতার কানাগলি পেরিয়ে এই বিপদসঙ্কুল পথে আমাদের অন্যতম আলোকবর্তিতা হতে পারে বিগত দশকে অন্ধ্রের কমিটি অব কনসার্নড সিটিজেনস-এর দীর্ঘস্থায়ী, ধৈর্য্য ও ধীসম্পন্ন উদ্যোগ। সিসিসি-র এই উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে অন্ধ্র সরকার ও মাওবাদীদের শান্তি-আলোচনা নানা কারণে ভেস্তে গেলেও মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তথা আদিবাসী-মূলবাসী প্রান্তজনের সহমর্মী নাগরিক সমাজের নিরপেক্ষ উদ্যোগ সমাজের সর্বস্তরে আজও প্রশংসিত। সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরে এহেন উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আজ অনেকেই অনুভব করছেন। এবং তা শুধু সরকার ও তার সশস্ত্র প্রতিস্পর্ধীদের মধ্যে শান্তি আলোচনার পটভূমি রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। যুদ্ধ ও শান্তি-পর্বের লাভ-ক্ষতি হিসেবের বাইরে মানবাধিকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে মনে রেখে সবপক্ষের পার্টিজানরা তাঁদের মানবিকতাবোধকে দ্বিচারিতামুক্ত করলে এবং আমজনতার প্রতি দায়বদ্ধতাকেই প্রাধান্য দিলে রাজবন্দিদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের নৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তি প্রসারিত হবে ও তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)